ভূ-উপগ্রহ যোগাযোগ এবং বাংলাদেশ

মনোরঞ্জন দাস

উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ

১১.১১.১৫ তারিখটি বাংলাদেশে যোগাযোগ প্রযুক্তির আধুনিক উজ্জ্বল নবযুগে প্রবেশের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের দিন হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। সেদিন যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ– 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে ফ্রান্সের বিখ্যাত থালেস এলেনিয়া স্পেস এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিআরটিসি) মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে যে স্বপ্নের- যে ভাবনার উন্মেষ হয়েছিল, তার বাস্তবায়নের পথে এক বড় অগ্রগতি অর্জিত হলো।

আধুনিক বিশ্বে উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা 'নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক' (network of networks) হিসেবে বিবেচিত। এ উচ্চপ্রযুক্তির যোগাযোগ ব্যবস্থাটি অবশ্য এ দেশে একেবারে অপরিচিত নয়– আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো (একমাত্র বিটিভির একটি সম্প্রচার চ্যানেল ব্যতীত) উপগ্রহের মাধ্যমেই দেশে এবং বিদেশেও অনুষ্ঠান সম্প্রচার কাজটি করে যাচ্ছে ইন্টারনেট ব্যবস্থায়। টেলিযোগাযোগে এর ব্যবহার রয়েছে আর স্যাটেলাইট ফোনও এ দেশে ব্যবহার হচ্ছে; কিন্তু এ প্রযুক্তিটি আমাদের নিজস্ব হয়নি এ যাবত। আমরা শুধু বিদেশি মালিকানাধীন যোগাযোগ উপগ্রহের পরিসেবা নিয়ে যাচ্ছি ভাড়ার বিনিময়ে। এতে ভাড়া বাবদ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশ থেকে চলে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বরং উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার পুরোপুরি ব্যবহার হচ্ছে না এবং এ প্রযুক্তির ব্যবহারে আমাদের দক্ষতার যথাযথ বিকাশ ঘটছে না, যা আমাদের ইপ্সিত জাতীয় প্রগতি অর্জনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই আমাদের নিজস্ব উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা সংস্থাপনার্থে সম্পাদিত চুক্তিটি জাতির এক 'নব আশার আলো'। চুক্তি অনুযায়ী ২০১৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতির বিজয় দিবসে উপগ্রহটি নির্ধারিত কক্ষপথে সংস্থাপিত হবে এবং তার মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে দেশের জন্য যে সুবিধাগুলো লাভ হবে সেগুলো হলো :

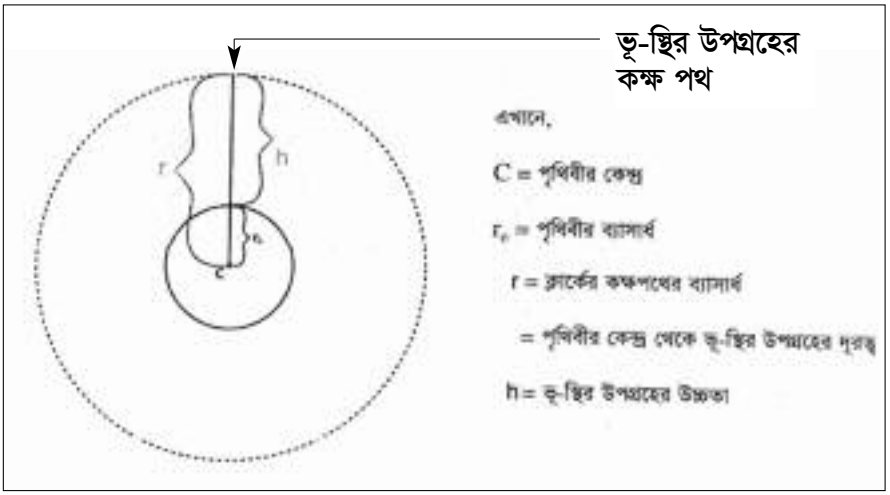

* সারাদেশের স্থল ও জলসীমায় নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচারের নিশ্চয়তা।
* ট্র্যান্সপন্ডার লিজের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয়।
* বর্তমানে বিদেশি স্যাটেলাইটের ভাড়া বাবদ প্রদেয় বার্ষিক ১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাশ্রয়।
* ডিটিএইচসহ স্যাটেলাইটের বিভিন্ন সেবার লাইসেন্স ফি ও স্পেকট্রাম চার্জ বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানো।
* স্যাটেলাইট টেকনোলজি ও সেবার প্রসারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
* বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার সেবার পাশাপাশি টেলিমেডিসিন, ই-লার্নিং, ই-এডুকেশন, ডিটিএইচ প্রভৃতি সেবা দেয়া।
* প্রাকৃতিক দুর্যোগে টেরিস্ট্রিয়াল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলে সারাদেশে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ সুবিধা দেয়া।
* বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কভারেজের আওতাভুক্ত অন্যান্য দেশে টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার সেবার বিস্তার ঘটিয়ে রাজস্ব আয়ের সুযোগ বাড়ানো।
* বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একটি পরিবেশবান্ধব যোগাযোগমাধ্যম।
* স্পেস টেকনোলজির জ্ঞানসমৃদ্ধ মর্যাদাশীল জাতি গঠনে অনবদ্য ভূমিকা রাখবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট।

এটি জাতীয় গৌরবে একটি নতুন সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রসঙ্গত, এ অর্জনের ইতিহাসের সাথে বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের একটি বিশেষ গৌরববোধের আবেগ জড়িত রয়েছে (এ বিষয়টি পরে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে)।

আমাদের এ উপগ্রহটি হবে একটি ভূ-স্থির উপগ্রহ। অর্থাৎ এটি পৃথিবীপৃষ্ঠের যেকোনো স্থানের প্রেক্ষিতে সব সময় শূন্যে একই অবস্থানে থাকবে। এর জীবনকালে (প্রায় ১৫-১৮ বছর) আমরা সব সময় একে শূন্যে একই জায়গায় পাব। কিন্তু এটি শূন্যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে কি করে? আর এর কার্যক্রমই বা কি হবে? এসব বিষয় এখানে আলোচিত হবে। প্রসঙ্গত, অন্য ধরনের যোগাযোগ উপগ্রহের বিষয়েও কিছুটা আলোকপাত করা হবে।

ভূ-স্থির উপগ্রহ পরিচিতি

ভূ-স্থির উপগ্রহের বিষয়টি বেশ চমৎকার। এর গতিপথ এমন যে, প্রত্যেকটি উপগ্রহ ভূ-পৃষ্ঠের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির; একেকটি ভূ-স্থির উপগ্রহের আপাত অবস্থান একেকটি নির্দিষ্ট নিরক্ষীয় স্থানের ▸

ঠিক উপরে, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩৫,৭৯৪ কিলোমিটার উচ্চতায়। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত বটে। শূন্যে এমন উঁচুতে কোনো বস্তুরই তো স্থির দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। বরং মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সেটির ধরাপৃষ্ঠে পতিত হওয়াই স্বাভাবিক। এ আশ্চর্য আপাতস্থির অবস্থানের কারণ হলো ভূ-স্থির উপগ্রহের কক্ষপথটি হচ্ছে ক্লার্কের কক্ষপথ (Clarke's Orbit)। স্যার আর্থার সি. ক্লার্কের নামানুসারে এই নামকরণ। যোগাযোগ উপগ্রহ বা উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার ধারণাটি এসেছে সেই পদার্থবিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, কল্পবিজ্ঞান-লেখক ও সাহিত্যিকের অসাধারণ সৃজনশীল লেখনী থেকে। ১৯৪৫ সালে একটি বিজ্ঞান সাময়িকীতে তার সে 'Extra-terrestrial Relay' প্রবন্ধটি ছিল যুগের চেয়ে অনেক অনেক অগ্রবর্তী। তখন পর্যন্ত কোনো উপগ্রহই পাঠানো হয়নি আকাশে, হয়তো বা কোনোরূপ উপগ্রহ পাঠানোর পরিকল্পনাও দানা বাঁধেনি ততদিনে বিশ্বের কোথাও। বস্তুত বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি (সোভিয়েত ইউনিয়নের 'স্ফুটনিক') পাঠানো হয়েছিল তার অনেক দিন পর– ১৯৫৮ সালে।

পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে আকাশে মানবনির্মিত কোনো উপগ্রহের এমন স্থির অবস্থান অবশ্যই কোনো অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা নয়, নয় তা 'পড়ন্ত বস্তুর সূত্র' বা পদার্থবিজ্ঞানের কোনো সূত্র-নিয়মের ব্যত্যয়। বরং গ্রহ-উপগ্রহের গতি-পরিভ্রমণ ব্যাখ্যার জন্য নিউটন-আবিষ্কৃত বিখ্যাত মহাকর্ষ সূত্র তথা চিরায়ত বলবিদ্যারই একটি মনোহরণ প্রয়োগ এটি। আমরা জানি, যেকোনো সুস্থিত গতিপথে আবর্তক গতির জন্য শর্ত হলো কেন্দ্রমুখী বল ও কেন্দ্রাতিগ বলের (Centripetal Force & Centrifugal Force) সাম্য। পৃথিবীকে বৃত্তপথে প্রদক্ষিণরত যেকোনো উপগ্রহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রমুখী বল নির্ভর করবে ভূ-কেন্দ্র থেকে ওই উপগ্রহের দূরত্ব ও ভরের ওপর আর কেন্দ্রাতিগ বল নির্ভর করবে উপগ্রহটির কৌণিক বেগ (মানে কত দ্রুত সেটি পাক খাচ্ছে) ও ভরের ওপর। অতএব পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে (তাই পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকেও, যেহেতু পৃথিবী গোলাকার) ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব বজায় রেখে প্রদক্ষিণরত উপগ্রহগুলোর কৌণিক বেগ ভিন্ন ভিন্ন হবে এবং সেজন্য আবর্তনকালও ভিন্ন ভিন্ন হবে। যেহেতু পৃথিবীর নিকটতর বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ দূরবর্তী বস্তুর ওপর প্রযুক্ত আকর্ষণ থেকে বেশি, তাই ভূ-কেন্দ্র থেকে স্থির দূরত্বে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত পৃথিবীর নিকটতর উপগ্রহের কৌণিক বেগ দূরবর্তী উপগ্রহের কৌণিক বেগ থেকে বেশি হতে হবে। অর্থাৎ কম দূরত্বে থেকে প্রদক্ষিণরত নিকটতর উপগ্রহের আবর্তনকাল বেশি দূরত্বে থেকে প্রদক্ষিণরত উপগ্রহের আবর্তনকাল থেকে কম হবে (সহজ গণিতের সাহায্যে দেখানো যায় যে, ভরের ওপর এর নির্ভরতা থাকছে না। গতি সমীকরণটির দুই পাশে থাকা 'm' কাটাকাটি যাচ্ছে)। এখন নিউটনীয় বলবিদ্যার সহজ প্রয়োগে এমন দূরত্ব হিসাব করে বের করা যায়, একটি বিশেষ দূরত্বে থেকে কোনো উপগ্রহ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করলে এর আবর্তনকাল হবে পৃথিবী তার নিজের অক্ষে ঘূর্ণনকালের সমান; অর্থাৎ এক দিন বা ২৪ ঘণ্টা[১]। হিসাব অনুযায়ী সে দূরত্ব ভূ-কেন্দ্র থেকে ৪২,১৬৫ কিমি (অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩৫,৭৯৪ কিমি। কারণ ভূ-কেন্দ্র থেকে ভূ-পৃষ্ঠের দূরত্ব হলো ৬,৩৭১ কিমি)। এমন কক্ষপথে উপগ্রহটির দ্রুতি হতে হবে প্রতি সেকেন্ডে ৩.০৭৫ কি.মি[২]। এখন এমন দূরত্বের কক্ষপথটি যদি ঠিক বিষুবরেখার বরাবর ঊর্ধ্বে হয়, অর্থাৎ তা যদি বিষুববৃত্তের সমান্তরাল একটি বৃহত্তর বৃত্তপথ হয় এবং যদি সে কক্ষপথে পরিভ্রমণরত উপগ্রহটির গতি পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে হয়, তবে উপগ্রহটি বিষুবরেখার যে স্থানের উপরে থেকে এমন গতিতে আবর্তনের জন্য স্থাপিত হবে, সব সময় ঠিক সে স্থানের ৩৫,৭৯৪ কিমি উপরেই সেটি অবস্থান করবে। পৃথিবী পৃষ্ঠের যেকোনো স্থানের প্রেক্ষিতে সেটি স্থির বলে প্রতিভাত হবে; যদিও আসলে তার 'বিরাম নেই আকাশের মাঝে'। যেহেতু পৃথিবী তার নিজ অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে যতক্ষণে একপাক ঘুরবে, উপগ্রহটিও ততক্ষণে পৃথিবীর

অক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক ততটুকু কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করবে। ততক্ষণে সে উপগ্রহটিও পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করবে। পৃথিবীপৃষ্ঠের যেকোনো স্থান যতক্ষণে পৃথিবীর অক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে যতটুকু কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করবে। তাই উপগ্রহটি আবর্তনশীল হলেও পৃথিবীর যেকোনো স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সেটির কোনো আপেক্ষিক গতি থাকবে না। এ ধরনের কক্ষপথের কথা স্যার আর্থার সি. ক্লার্কের আগে কেউ ভাবেননি– এমন হয়তো নয়। কারণ, চিরায়ত বা নিউটনীয় বলবিদ্যায় গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ বিষয়ে যে সাধারণ সমীকরণ রয়েছে, তারই একটি বিশেষ অবস্থা এটি, যেখানে উপগ্রহটির এক আবর্তনকাল পৃথিবীর তার অক্ষে এক ঘূর্ণনকালের সমান। তবে স্যার ক্লার্কের চিন্তার অসাধারণত্ব এই যে, এত আগে তিনি এমন নিখুঁতভাবে সঠিক গতিতে উপগ্রহ পাঠানোর সম্ভাব্যতাই শুধু ভাবেননি, তিনি সে উপগ্রহ বা তেমন উপগ্রহমণ্ডলী দিয়ে বেতার-যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ধারণাও দিয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করলেন যে, সে কক্ষপথে ১২০ ডিগ্রি ব্যবধানে প্রদক্ষিণরত মাত্র তিনটি উপগ্রহের সাহায্যে সারা পৃথিবীর সব জায়গা একটি বেতার-যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আনা সম্ভব। সেখানে পাহাড়-পর্বতের বাধা তো নয়ই, এমনকি পৃথিবীর গোলত্বের বাধাও কোনো সমস্যা নয়। তার সে অনন্যসাধারণ প্রবন্ধে আয়োনোস্ফেয়ার-নির্ভর ক্ষুদ্রতরঙ্গ (Short Wave) বেতার-ব্যবস্থার মানের অস্থিরতা বা নির্ভরযোগ্যতার অভাব ও সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও ব্যক্ত হয়েছে। আর তাই যথার্থভাবেই তার নামে ভূ-স্থির উপগ্রহের কক্ষপথটির নাম Clarke's Orbit রাখা হয়েছে। আমরা উপমহাদেশের অধিবাসীরা তাকে নিয়ে গর্ব করতে পারি এজন্য যে, তিনি জন্মসূত্রে ব্রিটিশ হলেও স্থায়ী অধিবাসী এবং নাগরিক ছিলেন উপমহাদেশেরই একটি দেশ শ্রীলঙ্কার।

ক্লার্কের কক্ষপথে পরিভ্রমণরত যেকোনো উপগ্রহ যেহেতু পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে স্থির, তাই যোগাযোগের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের সুবিধাটা বহুবিধ। প্রথমদিকে, ষাটের দশকের গোড়ায় এমন উপগ্রহকে শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিফলক (Passive Reflector) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। অর্থাৎ পৃথিবীর কোনো এক স্থান থেকে কোনো ভূ-স্থির উপগ্রহের দিকে বেতার-সঙ্কেত পাঠিয়ে সে উপগ্রহ থেকে প্রতিফলিত সঙ্কেত অন্য স্থান থেকে গ্রাহকযন্ত্রে ধরা হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই ব্যবস্থাটির বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হয়, উপগ্রহকে করা হয় সক্রিয় রিপিটার। এ ব্যবস্থায় ভূমিস্থ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র (Sattelite Earth Station) থেকে বা কোনো মোবাইল প্রেরক-গ্রাহক ইউনিট থেকে সব ধরনের বেতর-সঙ্কেত– টেলিফোন কল, রেডিও-টিভি অনুষ্ঠান, ইন্টারনেট-বার্তা প্রভৃতি উপগ্রহে পাঠানো হয় এবং উপগ্রহ থেকে আবার সঙ্কেতের শক্তি বাড়ায় ভূ-পৃষ্ঠের উদ্দিষ্ট অঞ্চলে পাঠানো হয়। এর ফলে উপগ্রহ রূপান্তরিত হয় শক্তিশালী রিলে কেন্দ্ররূপে, যা বেতার-যোগাযোগে এক যুগান্তকারী ব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ক্লার্ক কক্ষপথের এই যে চমৎকারিত্ব, ভূ-স্থির উপগ্রহের এই যে অভূতপূর্ব কার্যোপযোগিতা, এরও একটি সীমাবদ্ধতা আছে কক্ষপথটির বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই। হ্যাঁ, এর বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে, সেটি 'একমেবাদ্বিতীয়ম'– এক এবং অদ্বিতীয়; ▸

বিষুববৃত্তের ঠিক উপরে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় (পূর্ববর্ণিত) বিষুববৃত্তের সমান্তরাল সে কক্ষপথটি সম্পূর্ণভাবে সুনির্দিষ্ট। সুতরাং সে কক্ষপথে উপগ্রহ স্থাপনের মতো জায়গাও সীমিত। আবার এটা সহজেই বুঝতে পারা যায়, পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো স্থানের দ্রাঘিমাংশ অনুযায়ী ক্লার্ক কক্ষপথের যে বিন্দুটি পাওয়া যাবে, তাই হবে সেই স্থানে ব্যবহার্য কোনো ভূ-স্থির উপগ্রহের সর্বোত্তম অবস্থান। যেমন– বাংলাদেশের একটি উপগ্রহ স্থাপন করতে হলে এর আদর্শ অবস্থান হবে ক্লার্ক কক্ষপথে ৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ বিন্দু। সে বিন্দুটি ও কক্ষপথে সে বিন্দুর পূর্ব ও পশ্চিমের নিকটবর্তী অংশগুলো আবার ভারত, চীন, রাশিয়া, ভুটান ও মঙ্গোলিয়ার জন্যও আদর্শ ও উপযোগী। কারণ, ৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখাটি সেসব দেশের ওপর দিয়েও গেছে। বস্তুত ক্লার্ক কক্ষপথটির অনেকটা অংশজুড়েই এমন অবস্থা, স্থানপ্রাপ্তির এমন সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার পরিবেশ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশ যথেষ্ট আগে ক্লার্ক কক্ষপথে উপগ্রহ সংস্থাপনের উদ্যোগ নেয়নি। ফলে এর মধ্যেই তার আদর্শ বিন্দু (কক্ষপথটির ৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ) তো বটেই, এর পূর্ব ও পশ্চিমের অনেকটা স্থানই আগ্রহী অন্য দেশগুলোর উপগ্রহ দিয়ে দখল হয়ে গেছে।

বাংলাদেশে ভূ-স্থির উপগ্রহ প্রকল্পের সূচনা

'এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের বিলম্ব কক্ষপথে আমাদের সুবিধাজনক অবস্থান অধরা হয়ে যাবে'– এ চিন্তা থেকে বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের পক্ষ থেকে ১৯৯৯ সালের দিকে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়। বিষয়টির প্রতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব ফজলুর রহমান, যিনি নিজে এককালে ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের তুখোড় ছাত্র, খুবই আগ্রহী হন এবং বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তার মাধ্যমে বিষয়টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জে. নূরুদ্দিন খানের দৃষ্টিতে নেয়া হলে তিনিও এতে আকৃষ্ট হন এবং কাজে আন্তরিক সমর্থন ব্যক্ত করেন।

'স্পারসো'র (SPARSO) তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. এএম চৌধুরীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় সে উদ্যোগে। তৎকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করানো সম্ভব হয়। এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের একটি উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে 'বাংলাদেশের ভূ-স্থির উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ প্রেরণের প্রকল্প' গৃহীত হয়; আর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ প্রকল্প খাতে অর্থ বরাদ্দও রাখা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরবর্তীকালে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত বা কারিগরি বিবেচনার বহির্ভূত অন্য বিবেচনায় প্রকল্পটি বাদ দেয়া হয়। ব্যাপারটি ছিল সাবমেরিন অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের প্রস্তাব নাকচের মতোই মারাত্মক এক পশ্চাৎমুখী সিদ্ধান্ত। পরবর্তীকালে ২০০৭ সালে বর্তমান লেখকের পক্ষ থেকে ভূ-স্থির উপগ্রহের বিষয়টিকে আবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়। সেবার অবশ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে নতুন করে প্রকল্প চালু করা সম্ভব হয়নি। তাই বিটিআরসির তদানীন্তন চেয়ারম্যান জে. মঞ্জুরুল আলমের কাছে বিষয়টি তুলে ধরা হয়। তিনি এর গুরুত্ব অনুধাবন করেন। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং স্যাটেলাইট যোগাযোগের প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। তবে দুঃখের বিষয়– এখন কাজটি ২০০১-০২ সালের তুলনায় অনেক বেশি জটিল হয়ে পড়েছে। কারণ, এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পৃথিবী তো আর বসে থাকেনি। এর মধ্যে অনেক দেশ বহু উপগ্রহ স্থাপন করে আমাদের পছন্দের স্থানে উপগ্রহ-ভিড় অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে কক্ষপথের আমাদের সুবিধাজনক, নিদেনপক্ষে মোটামুটি সুবিধাজনক স্থান পাওয়া যেমন কঠিনতর হয়েছে, তেমনি কঠিনতর হয়েছে এতসব উপগ্রহের ট্রান্সপন্ডারের সাথে ফ্রিকুয়েন্সি সমন্বয়ের দিকটিও। যারা আগে স্থান কাজে লাগাবে, আগে ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড কাজে লাগাবে, আন্তর্জাতিক সংস্থা আইটিইউ (ITU) কর্তৃক তাদের অধিকারটাই প্রাথমিকভাবে মেনে নেয়া হয়। তাই যত দিন যাচ্ছে, আমাদের জন্য বিষয়টি ততই কঠিনতর হয়েছে পড়ছে। এদিকে ব্যয় ও অন্য সব দিক বিবেচনায় যেহেতু আপাতত আমরা একটির বেশি এমন উপগ্রহ স্থাপনের চিন্তা করতে পারছি না, তাই পুরো পৃথিবী সে উপগ্রহের যোগাযোগের আওতায় আনতে হলে অন্য কোনো আন্তর্জাতিক উপগ্রহ-সংস্থার উপগ্রহগুলোর সাথে এর আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ (আগেই উল্লেখ করা হয়েছে), অন্তত তিনটি ভূ-স্থির উপগ্রহের কমে পুরো পৃথিবীকে যোগাযোগের আওতায় আনা সম্ভব নয়। তাই আন্তঃসংযোগ সুবিধা নেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক কভারেজসম্পন্ন কোনো উপগ্রহ-সংস্থা নির্বাচন করে তাদের সাথে কার্যকর আলোচনাপূর্বক যৌথ সহযোগিতা বিধান করা দরকার। ▶

নিজস্ব স্যাটেলাইটের দাবি

অক্টোবর ২০০৩ সংখ্যার প্রচ্ছদ

কমপিউটার জগৎ ২০০৩ সালের দিকে এক অনুসন্ধানে জানতে পারে, শুধু আইএসপি ও প্রাইভেট চ্যানেলের সম্প্রচারে প্রতিমাসে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে দেশ থেকে চলে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা। নিজস্ব উপগ্রহ ব্যবস্থা গড়ে তুলে আমরা বাঁচাতে পারি এই অপচয়। একই সাথে আয় করতে পারি কোটি কোটি টাকা। এছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তিকে ছড়িয়ে দিতে হলে আমাদের প্রয়োজন নিজস্ব উপগ্রহ। আমাদের নিজস্ব উপগ্রহের প্রয়োজন বিশ্লেষণ করে আমরা কমপিউটার জগৎ-এর অক্টোবর ২০০৩ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন রচনা করে এই বিষয়ের ওপর। আর এর যথার্থ যৌক্তিক কারণে এই প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের একটি দাবিধর্মী শিরোনাম করে– 'বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট চাই'।

এই প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা বলতে চাই, কেনো আমরা নিজস্ব স্যাটেলাইট চাই? এই প্রতিবেদনে আমরা উল্লেখ করি– 'বাংলাদেশের আদৌ কোনো স্যাটেলাইটের প্রয়োজন আছে কি না? এবং থাকলেই বা এর গুরুত্ব কতটুকু? স্যাটেলাইট কেনা না লিজ নেয়া, কোনটি বাংলাদেশের জন্য যুক্তিযুক্ত?' এই প্রতিবেদনে আমরা উল্লেখ করি, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বৈধ আইএসপির সংখ্যা ৭০টি। এর মধ্যে প্রথমসারির দশটি আইএসপি ব্যবহার করে গড়পড়তায় ৩ এমপিবিএস (মেগাবিট পার সেকেন্ড) ব্যান্ডউইডথ। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের চাহিদা সর্বনিম্ন ৯০ এমপিবিএস এবং সর্বোচ্চ ১৫০ এমপিবিএস। আর এ সময়ে ১ মেগাবিট একমুখী ডাটা কিনতে খরচ হয় গড়ে মাসিক ৪ হাজার ইউএস ডলার। একটু মাথা খাটালেই বোঝা যায়, প্রতিমাসে আমাদের এই গরিব দেশ থেকে এ খাতে বাইরে চলে যায় ৩,৬০,০০০ থেকে ৬,০০,০০০ ডলার। প্রতিবছর আমাদের দেশে ইন্টারনেটের চাহিদা যে হারে বেড়ে চলেছে, সে অনুযায়ী আগামী কয়েক বছরে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আগামী পাঁচ বছরে আমাদের মাসিক গড়পড়তা চাহিদা যদি ২০০ এমপিবিএস ধরি, তবে মাসে খরচ হবে ৮,০০,০০০ ডলার। পাকিস্তানের পাঁচ বছরে লিজ নেয়া স্যাটেলাইটের জন্য মোট খরচ ৩ কোটি ডলার। বাংলাদেশ যদি পাকস্যাট-১-এর মতো একটি স্যাটেলাইট পাঁচ বছরের জন্য লিজ নেয়, তবে শুধু আইএসপি খাতে হিসাব করলে স্যাটেলাইটের মোট মূল্য পরিশোধ হতে সময় নেবে ৩৭.৫ মাস বা প্রায় তিন বছর। বাকি দুই বছর আমাদের কোনো ইন্টারনেট চার্জ দিতে হবে না। এতে সাশ্রয় হবে কোটি কোটি টাকা।

এছাড়া আমরা এই প্রতিবেদনে নিজস্ব উপগ্রহ স্থাপনের সুবিধাজনক দিকটি তুলে ধরেছি। সে যা-ই হোক, সরকার বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট ব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে এ ব্যাপারে কাজ করছে। সম্প্রতি এ ব্যাপারে অনেক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

ভূ-স্থির উপগ্রহের উৎক্ষেপণ ও কার্যক্রমের আরও কিছু তথ্য

উপগ্রহ উৎক্ষেপণ ও কক্ষপথে স্থাপনের জন্য রকেট, যা এমন শক্তিতে কাজ করে যে, উৎক্ষেপণের মাত্র ৩০ থেকে ৪০ মিনিটের মধ্যে উপগ্রহকে ভূমি থেকে ১৫ হাজার কিলোমিটার উচ্চতার আবর্তন পথে নিয়ে যায়। এরপর উপগ্রহ তার সৌর প্যানেলের সে অংশটি ছড়িয়ে দেয়, যা দিয়ে তার শূন্যে পরিক্রমণকালে প্রয়োজনীয় সুষম বিদ্যুশক্তি সরবরাহ করা হয়। Jet propulation বা জেট প্রচলন ক্রমান্বয়ে গতিপথটি আরও বৃত্তাকার করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না উপগ্রহটি নিখুঁত বৃত্তাকার ভূ-স্থির কক্ষে তার আবর্তনী অবস্থান নেয়। এভাবে উৎক্ষেপণের তিন থেকে চার সপ্তাহ সময় নিয়ে এ চূড়ান্ত আবর্তনী অবস্থায় পৌঁছার পরই ভূ-স্থির উপগ্রহ তার সৌর প্যানেল এবং অ্যান্টিনাগুলো সম্পূর্ণভাবে মেলে দেয়; যাতে এর ডানায় বিস্তার দাঁড়ায় প্রায় ৪০ মিটার।

সে কক্ষপথে শূন্যতায় সৌর ও মহাজাগতিক বিকিরণের প্রাবল্য, চরম ঠাণ্ডা ও গরম অবস্থা, যা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের ১৫০ ডিগ্রি নিচে থেকে ১৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত হয়ে থাকে, এমন বিরূপ পরিবেশের মাঝেই উচ্চপ্রযুক্তিতে নির্মিত উপগ্রহ ১৫ বছরেরও বেশিকাল কার্যকর থাকে। যেকোনো যোগাযোগ উপগ্রহের কাজ হল– পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে (ভূমি থেকে) পাঠানো সঙ্কেতাদি বা সিগন্যালগুলো গ্রহণ করে তা আবার উপগ্রহটির যোগাযোগ আওতা এলাকায় (coverage area) পুনঃপ্রেরণ করা।

প্রেরিত সঙ্কেত বা সিগন্যাল পাঠানো হয় ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রেরণ কেন্দ্র থেকে, আর সে সঙ্কেত হতে পারে টেলিভিশন অনুষ্ঠান, হতে পারে ডাটা বা ইন্টারনেট কানেকশন। পুরো লক্ষিত এলাকা বা কভারেজ এলাকায় সিগন্যাল আবার পাঠানোর জন্য সিগন্যালকে উপযুক্তভাবে বিবর্ধন বা অ্যাম্লিফাই করা আবশ্যক হয়। এ কাজের জন্য গ্রাহক অ্যান্টিনা ও প্রেরক অ্যান্টিনার মাঝে থাকে ট্রান্সপন্ডার অ্যাম্লিফায়ার। সবগুলো যন্ত্র একটি কেন্দ্রীয় অংশে আটকানো থাকে এবং উৎপাদিত তাপ কাজটি করে। বাইরের পরিবেশের বিরূপতার প্রেক্ষিতে অন্তরক বাধা হিসেবে কাজ করে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছাড়াও এ অংশে থাকে প্রচলন বা প্রপলাশন ব্যবস্থা এবং জ্বালানি ট্যাঙ্কে ব্যবস্থাটি উপগ্রহের ওপর সূর্য-চন্দ্র ও পৃথিবীর আকর্ষণজনিত জটিলতার ফলে সৃষ্ট অবস্থানের ব্যত্যয় সংবোধন করে উপগ্রহটির নির্দিষ্ট আবর্তন অবস্থান বজায় রাখার কাজ করে।

সোলার প্যানেল দুটি উপগ্রহের জীবনকালে সব কার্যক্রম চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করে। এটি তাই সবচেয়ে পরিবেশবান্ধব যোগাযোগ পদ্ধতি। উপগ্রহ যখন পৃথিবীর মধ্য দিয়ে যায় সে সময় অবশ্য রিচার্জেবল ব্যাটারিগুলো বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজটি চালিয়ে যায়।

রকেট উৎক্ষেপণের প্রায় আধঘণ্টা পরেই নিয়ন্ত্রণ কক্ষ উপগ্রহের সাথে প্রথম যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। সে সময় থেকেই নিয়ন্ত্রণ কক্ষটি উপগ্রহের সব যন্ত্রপাতি সদা পর্যবেক্ষণ করে যায় এবং প্রতি দুই সপ্তাহ পরপর প্রচালন বা প্রপলাশন ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে উপগ্রহকে সঠিক আবর্তন অবস্থানে রাখার ব্যবস্থা করে।

দ্বিতীয়ত, একটি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র সঙ্কেত মান পর্যবেক্ষণ করে এবং উপগ্রহে সঙ্কেত প্রেরণকারী সবগুলো প্রেরণকেন্দ্র সঙ্কেতের সঠিক কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকুয়েন্সিও সঠিক শক্তি বজায় রাখছে কি না তা নিশ্চিত করে সঙ্কেতগুলোর পারস্পরিক ব্যতিচার বা interference এর ঝুঁকি নিরসন করে।

আরও দুই ধরনের যোগাযোগ উপগ্রহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রসঙ্গক্রমে, ভূ-স্থির উপগ্রহ-ব্যবস্থা– যাকে বলা হয় GEO (Geo-Stationary Earth Orbit) উপগ্রহ ব্যবস্থা– ছাড়া যোগাযোগ-ব্যবস্থায় অন্য যেসব উপগ্রহ ব্যবহার হতে পারে, তাদের সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। তাদের মধ্যে একশ্রেণী হলো LEO (Low Earth Orbit), অন্য শ্রেণী হলো MEO (Midium Earth Orbit) উপগ্রহ। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এলইও উপগ্রহগুলোর উচ্চতা অনেক কম (১০০০ থেকে ২৫০০ কিলোমিটার) এবং এদের কৌণিক বেগ অনেক বেশি। এরা পৃথিবীপৃষ্ঠের স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির নয়, বরং অনেক দ্রুত পৃথিবীকে আবর্তন করে থাকে। আর এমইও উপগ্রহগুলোর উচ্চতা জিইও উপগ্রহগুলো থেকে বেশি। কিন্তু জিইও বা ভূ-স্থির উপগ্রহের তুলনায় বেশ নিচু। এরাও পৃথিবীপৃষ্ঠের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির নয় বরং জিইও উপগ্রহ থেকে দ্রুততর কৌণিক বেগে অর্থাৎ জিইও উপগ্রহের চেয়ে স্বল্পতর সময়ে পৃথিবীকে আবর্তন করে থাকে। জিইও উপগ্রহের তুলনায় এদের সুবিধা হলো– পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এদের দূরত্ব কম হওয়ায় এদের সাথে বেতার সংযোগে অল্পতর শক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু অসুবিধা হলো জিইও উপগ্রহের মতো এরা কোনো স্থানের পরিপ্রেক্ষিতেই স্থির নয় এবং এদের কোনোটাই সারাক্ষণ ধরে কোনো স্থানের সাথে বেতার-সংযোগের উপযোগী থাকে না, বরং যেকোনো স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সবারই উদয় ও অস্ত রয়েছে। তাই যেকোনো স্থানে এলইও-এমইও উপগ্রহের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা করতে হলে এমন উপগ্রহ দলের প্রয়োজন পড়ে, যাতে এদের কোনোটা যখন অস্ত যায় বা যোগাযোগের উপযুক্ত স্থান থেকে সরে যায়, তখন অন্য একটি উদিত হয়ে উপযুক্ত স্থানে চলে আসে। সে উপগ্রহগুলো সতত চলমান বলে অ্যান্টিনার ট্র্যাকিং ক্ষমতা থাকতে হয়। আমাদের জন্য তাই নিজস্ব এলইও বা এলইও-এমইও উপগ্রহমণ্ডলীবিশিষ্ট কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয় এ মুহূর্তে ঠিক জরুরিভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে না।

উপসংহার

প্রথম উদ্যোগ ও প্রাথমিক কয়েক বছরের অর্জিত অগ্রগতির বিপরীতে নিজস্ব ভূ-স্থির উপগ্রহের প্রকল্পটি বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে এবং এরপর প্রায় এক দশক চলে যাওয়ায় এর মাঝে এসব কাজে যে জটিলতা বেড়েছে তাতে অর্থ, দক্ষ জনবল এবং প্রকল্প-প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাল হবে আগের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। আর কক্ষপথে আমাদের উপগ্রহটি স্থাপিত হতে হচ্ছে আমাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থান (৯০ ডিগ্রি পূর্ব) থেকে বেশ একটু দূরেই ১১৯.১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমায়। আরও দেরি করলে যে আরও দূরের অবস্থানে বা অসুবিধাজনক অবস্থান পাওয়া যেত, তা ধারণা করা যায়। তাই এ অবস্থান মেনে নিয়েই যথাসম্ভব সর্বোত্তম ব্যবস্থা গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই এখন কর্তব্য। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দেশের অগ্রগতিতে অনন্য ভূমিকা রাখবে এবং একটি কার্যকর সফল উপগ্রহ হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে– এ আমাদের ঐকান্তিক আশা কজ

লেখক : বেতার সম্প্রচার বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে এবিসি রেডিওর উপদেষ্টা।

পাদটিকা-১ : *প্রকৃতপক্ষে নিজ অক্ষের ওপর পৃথিবীর একবার পূর্ণ ঘূর্ণনকাল ঠিক ২৪ ঘণ্টা নয়, বরং ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪.০৯১ সেকেন্ড (প্রায়)। এখানে ২৪ ঘণ্টা বলে উল্লেখ করা হলো এজন্য যে, ২৪ ঘণ্টার বিষয়টাই সাধারণভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য বা আমরা সহজে দেখতে পাই এবং ধরে নিয়ে থাকি। সূর্য যখন মধ্যাহ্নে ঠিক মাথার উপরে থাকে (বা দিনের মধ্যে আকাশে তার সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকে) তখন থেকে পরদিন সূর্যের অনুরূপ অবস্থানে আসা পর্যন্ত সময়কেই বলা হয় ২৪ ঘণ্টা। তাই সূর্যকে পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে স্থির ধরে নিয়ে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ঘূর্ণনকালকে ২৪ ঘণ্টা বলাটা সহজে বোধগম্য বা আপাতদৃষ্টে যৌক্তিক। কিন্তু প্রকৃত হিসেবের জন্য এ বিষয়টা বিবেচনা করতে হবে, সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে পৃথিবীর এক ঘূর্ণনের সময়ের মধ্যে পৃথিবী তার কক্ষপথে আগের অবস্থান থেকে সরে যাওয়ার ফলে সূর্যকে একই অবস্থানে দেখতে হলে পৃথিবীকে এক পূর্ণ ঘূর্ণনের চেয়ে একটু বেশি ঘুরতে হবে। সেই বেশি ঘূর্ণনের সময়টাই হলো ৩ মিনিট ৫৫.৯০৯ সেকেন্ড। আসলে তাই নিজের অক্ষের ওপর পৃথিবীর প্রকৃত ঘূর্ণনকাল ২৪ ঘণ্টা– ৩ মিনিট ৫৫.৯০৯ সেকেন্ড=২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪.০৯১ সেকেন্ড। এ সময়টা আমরা পাই যখন সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে না ধরে দূরের কোনো নক্ষত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পৃথিবীর ঘূর্ণনকালটা হিসেব করি। এ সময়টাকে তাই নাক্ষত্রিক দিবস (Sidereal day) বলা হয়। ২৪ ঘণ্টার দিনকে যেমন বলা হয় সৌরদিবস। আর ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪.০৯১ সেকেন্ড ঘূর্ণনকাল হিসেবেই ভূ-স্থির উপগ্রহের উচ্চতা (৪২,১৬৫ কিমি/৩৫,৭৯৪ কিমি) ও দ্রুতি (৩.০৭৫ মিমি) নির্ণিত হয়েছে এবং সেভাবেই উপগ্রহগুলো কক্ষপথে স্থাপিত হয়ে 'ভূ-স্থির' হিসেবে আবর্তিত হচ্ছে বা ভূ-পৃষ্ঠের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির হিসেবে আকাশে ক্লার্কের কক্ষপথে অবস্থান করছে।*

পাদটিকা–২ *(শুধু বিশেষ আগ্রহী এবং পদার্থবিদ্যা-গণিতের ভিত্তিসম্পন্ন পাঠকদের জন্য)।*

Clarke's Orbit:-

For rotation in circular orbit with a certain v or ε

Centripetal force = Centrifugal force

$= m\omega^2 r$ [also mv^2/r]

$= m\omega^2 r = \mu GM$

$=3.9861352 \times 10^5 km/sec^2$

$\Rightarrow \omega 2 =$ Which gives $\rightarrow$ $=$

$\therefore T^2 =$ $\Rightarrow r = T^2\mu/4\pi^2$ With

$T =$ $r = 42.165$ km, $r = re+h$ $\therefore$ h r-re = 42,165-6371 = 35m 794 km

$v = \omega e =$ $=$ $=3.075$ km/s

Lenght of the Clarke's Orbit (the circubnference) = $2\mu r$ = 264930.5 km

Lenght of are per degree = 264930.5/360 = 735.9 km